গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭১ বর্ষ ১৯ সংখ্যা | ২১ - ২৭ ডিসেম্বর ২০১৮ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা

মন্দির মসজিদ করেও ভোটে হারল বিজেপি

পাঁচ রাজ্যে ভোট

সঞ্জয় সাঠে, নাসিকের পেঁয়াজ চাষি, যাঁকে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সামনে কৃষিতে 'আচ্ছে দিনের' মুখ বলে তুলে ধরেছিলেন প্রধানমন্ত্রী, সেই সঞ্জয় ৭৫০ কেজি পেঁয়াজ বিক্রি করে পাওয়া ১০৬৪ টাকাপাঠিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীরই কাছে। 'আচ্ছে দিনের' ভারতে ওই ক'টা টাকায় তো আর পরিবারের পেটে ভাত জুটবে না, তাই আচ্ছে দিনের ফেরিওয়ালাই বরং নিন ওটা।

দেশের এমন অনেক চাষিই নানা ভাবে তাঁদের ফসলের দাম না পাওয়ার ক্ষোভ-দুঃখ জানিয়ে চলেছেন। একটাই প্রত্যাশা, প্রধানমন্ত্রী নিজের 'মন কি বাত' বলতে ব্যস্ত না থেকে চাষিদের 'দুখ কি বাত' একটু শুনুন ! প্রধানমন্ত্রী কর্ণপাত করেননি।

মানুষের ঘরে ঘরে অভাব হাঁ করে তেড়ে আসছে। যুবকের চাকরি নেই, চাষির ফসলের দাম নেই, ছেলেমেয়েদের শিক্ষা নেই, রোগীর চিকিৎসা নেই ! প্রধানমন্ত্রীর বাণী— সব ভুলে যাও, দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মূর্তি আর রাম মন্দির করে দিচ্ছি। মানুষ চাইল রুটি, কাপড় আর বাসস্থান, চাইল কাজ, শিক্ষা, চিকিৎসা। প্রধানমন্ত্রী দিলেন 'গো-রক্ষার রাজনীতি'। তাই আজপাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটে বিজেপির পরাজয়ে সাধারণ মানুষের উচ্ছ্বাস ফেটে পড়ছে। মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, রাজস্থানে বিজেপি মসনদ খুইয়েছে। তেলেঙ্গানায় প্রায় মুছে গিয়েছে। মিজোরামে কংগ্রেস বিরোধী জোটে মদত দিলেও বিজেপির নিজের শক্তি বিশেষ কিছু নেই। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফল দেখিয়ে দিয়েছে হিন্দি বলয়তেই সবচেয়ে বেশি জনরোষ আছড়ে পড়েছে বিজেপি তথা নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে। 'মোদি ম্যাজিক' কিংবা রাম মন্দিরের হুঙ্কারকে ছাপিয়ে উঠেছে ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে খেটে-খাওয়া মানুষের জীবন-জীবিকার দাবি।

মধ্যপ্রদেশের মন্দসৌরে ছ'জন কৃষককে গুলি করে হত্যা করেছিল বিজেপি সরকার। তাতেও কৃষক আন্দোলন থামেনি বরং ছড়িয়ে পড়েছে দেশের প্রান্তে প্রান্তে। রাজ্যে রাজ্যে কৃষক বিরোধী এবং করপোরেট পুঁজির স্বার্থবাহী কৃষিনীতির বিরুদ্ধে বারবার আন্দোলন ফেটে পড়েছে। দিল্লিতেও সেই আন্দোলনের ঢেউ পৌঁছেছে। কৃষকরা তাঁদের ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ভোটের মেশিনে। শহরের মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত মানুষ থেকে শুরু করে ছোট ব্যবসায়ী যারা নোট বাতিল এবং জিএসটি-র ধাক্কায় একেবারে দুর্দশার শেষ সীমায় চলে গেছেন তাঁরাও চেয়েছেন বিজেপিকে শিক্ষা দিতে। সব মিলিয়ে এই নির্বাচনে মুখ থুবড়ে পড়েছে বিজেপি।

২০১৪-র নির্বাচনের আগে থেকেই মানুষ শুনেছে মোদি ম্যাজিকের প্রচার। কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ তখন সারা দেশ জুড়ে ফেটে পড়ছে। সেই ক্ষোভকে আন্দোলনের পথ থেকে সরিয়ে ভোটের বাক্সে চালান করে নির্বিষ করে দিতে না পারলে বুর্জোয়া

দুয়ের পাতায় দেখুন

আগামী শিক্ষাবর্ষেই
প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চাই
২১ ডিসেম্বর শিক্ষামন্ত্রীকে ডেপুটেশন

এস ইউ সি আই (সি)-র দীর্ঘ আন্দোলনের জেরে গত বছর রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, পাশ-ফেল চালু করবেন। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারও অনেক টালবাহানার পর পাশ-ফেল প্রথা ফিরিয়ে আনতে শিক্ষার অধিকার আইনে কিছু সংশোধনী আনে এবং লোকসভায় তা পাশও হয়। কিন্তু রাজ্যসভায় সেই সংশোধনী পাশ করানোর কোনও উদ্যোগ এখন পর্যন্ত নেওয়া হয়নি। ফলে দুই সরকার পাশ-ফেল চালু করতে নীতিগতভাবে সম্মত হলেও চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় কাজগুলি ফেলে রেখেছে। এই অবস্থায় এস ইউ সি আই (সি) আবারও আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। ২১ ডিসেম্বর দলের পক্ষ থেকে সারা রাজ্যে দাবি দিবস পালন এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবিপত্র পেশের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। একই দিনে ছাত্রসংগঠন এআইডিএসও এবং শিক্ষক-অধ্যাপক-বুদ্ধিজীবীদের সংগঠন অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির পক্ষ থেকে দিল্লিতে পার্লামেন্টের সামনে বিক্ষোভ দেখানোর এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে ডেপুটেশন দেওয়ার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার পথপ্রদর্শক এ রাজ্যের পূর্বতন সিপিএম সরকার। পরে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার শিক্ষার অধিকার আইনের নামে নানা চটকদারি কথার আড়ালে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার ফরমান জারি করে। সেই নির্দেশিকা এ রাজ্যে কার্যকর করে তৃণমূল সরকার। অন্যান্য রাজ্যে কোথাও বিজেপি, কোথাও আঞ্চলিক দলগুলি তা কার্যকর করে। ন্যূনতম প্রতিবাদটুকুও তারা কেউ করেনি। একমাত্র

ছয়ের পাতায় দেখুন

রাজ্য জুড়ে ধিক্কার
৬-১২ ডিসেম্বর সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সপ্তাহ পালিত

৬ ডিসেম্বর, মানুষের মনে বারবার ফিরে আসে ১৯৯২ সালের সেই কালো দিনের কথা। ৫০০ বছরের এক প্রাচীন সৌধ বাবরি মসজিদকে গাঁইতি-হাতুড়ির ঘায়ে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছিল বিজেপি-আরএসএস-বিশ্ব হিন্দু পরিষদ-বজরঙ্গ দলের দুষ্কৃতী বাহিনী। তারপর তাদের মদতপুষ্ট দাঙ্গায় নানা রাজ্যে নিহত হয়েছিলেন হাজারের বেশি মানুষ।

এই বছর এস ইউ সি আই (সি) দল ডাক দিয়েছিল ৬-১২ ডিসেম্বর সারা বাংলা জুড়ে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সপ্তাহ পালনের। ৬ ডিসেম্বর রাজ্যের সমস্ত শহর-গঞ্জ-গ্রামীণ বাজার এলাকায় সারা দিনব্যাপী অবস্থান, সভা, সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতে অংশ নেন বেশ কয়েক হাজার মানুষ। সপ্তাহব্যাপী নানা কর্মসূচিতে এলাকায় এলাকায় পদযাত্রা, সাইকেল মিছিল, নাটক-গান-আবৃত্তি সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনে অংশগ্রহণ করেন বিভিন্ন গণসংগঠন, ফোরাম ইত্যাদি।

১২ ডিসেম্বর শিলিগুড়ি এবং কলকাতাতে বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে ধিক্কার মিছিল হয়। শিলিগুড়ির

চারের পাতায় দেখুন

● *১২ ডিসেম্বর কলকাতার রাজাবাজারে সমাবেশ*

৮-৯ জানুয়ারি দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক

কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী আইন ও নীতি প্রত্যাহার, বিলগ্নিকরণ বন্ধ করা, মূল্যবৃদ্ধি রোধ, বেকারদের কাজ, ৮ ঘণ্টা শ্রম দিবস, ন্যূনতম মজুরি ১৮ হাজার টাকা, সমকাজে সমমজুরি, সকল শ্রমিকের পেনশন ও সামাজিক সুরক্ষা সহ ১২ দফা দাবিতে এ আই ইউ টি ইউ সি সহ ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও স্বতন্ত্র জাতীয় ফেডারেশন সমূহের যৌথ মঞ্চ এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে।

কেন্দ্রের ধূর্ত বিজেপি সরকার 'শ্রমেব জয়তে' বা শ্রমের বিজয় ধ্বনি তুলে শ্রমিকদের দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত অধিকার হরণ করার পরিকল্পনা নিয়েছে। শ্রম আইনকে সংশোধন করে ৪টি কোডে (মজুরি, শিল্প সম্পর্ক, সামাজিক সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য-নিরাপত্তা ও কাজের পরিবেশ) যুক্ত করা হবে। আইনগুলিকে এমন ভাবে পাল্টানো হচ্ছে— যাতে নতুন করে শ্রমিক ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন অসম্ভব হয়ে পড়ে। শ্রমিক আন্দোলনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার ধর্মঘট। তাকেও বেআইনি ঘোষণা করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। পি এফ, পেনশন, ই এস আই স্কিম পরিবর্তন করা হচ্ছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলোতে বেসরকারিকরণ ও বিলগ্নিকরণ ব্যাপকভাবে করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ, কয়লা খনি, বিমা, বন্দর সহ বহু ক্ষেত্রেই তা কার্যকর করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার ফিক্সড টার্ম এমপ্লয়মেন্ট আইন এনে স্থায়ী কাজে স্থায়ী চাকরির রীতিকে বিসর্জন দিচ্ছে। যে কোনও কাজের জন্যই অল্প সময়ের চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ করছে সরকার ও মালিকরা। বর্তমানে তারা হায়ার অ্যান্ড ফায়ার নীতিতে চলছে। প্রয়োজনে কাজে নাও, প্রয়োজন ফুরালে

সাতের পাতায় দেখুন

ভোটে হারল বিজেপি

একের পাতার পর

শ্রেণির বিপদ। তাই তাদের দরকার হয়েছিল 'সর্বরোগহর' দাওয়াইয়ের মতো সব সমস্যার সমাধান করার ম্যাজিক দেখানো এক অবতারের আমদানি করা। যাকে দেখিয়ে আবার কিছুদিন মানুষকে শান্ত রাখা যায়। তাই গোটা করপোরেট মহল সেদিন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নরেন্দ্র মোদিকে অবতার বানানোর কাজে। পরিকল্পিত সেই প্রচারের তোড় এমন ছিল যে, বহু মানুষ যাঁরা গভীরে গিয়ে রাজনীতির চরিত্র বিচারে আগ্রহী নন, বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন 'আচ্ছে দিন' এল বলে। তিনি কালো টাকা উদ্ধার করে প্রত্যেক দেশবাসীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা ভরে দেবেন, বছরে দু'কোটি বেকারের চাকরি দেবেন, চাষির আয় দ্বিগুণ করে দেবেন, ইত্যাদি কত কী! বলেছিলেন, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও। এমন কত ম্যাজিকের গল্প যে ছড়ানো হয়েছে তার সীমা নেই। গুজরাট দাঙ্গার প্রধান মুখ নরেন্দ্র মোদির মুখে সেদিন যেন উন্নয়ন ছাড়া কথাই ছিল না। বাংলার নামকরা দৈনিক লিখেই ফেলেছিল, 'গুজরাটি অস্মিতা আর হিন্দুত্বের পথ ছাড়িয়া উন্নয়নের কাণ্ডারি আজ নরেন্দ্র মোদি'। একচেটিয়া পুঁজি মালিকরা প্রায় সকলেই সেদিন নরেন্দ্র মোদিকে জেতাতে অকাতরে খরচ করেছেন। এই বিপুল মানি পাওয়ারের জোরেই প্রচার-পেশিশক্তি-প্রশাসনিক সমস্ত আনুকূল্য কাজ করেছিল বিজেপিকে জেতাতে। এরপর যখন ধীরে ধীরে মানুষের মোহ কাটতে শুরু করেছে—ম্যাজিক আর তেমন কাজ করছে না, সেই সময়েও অর্থনীতির সমস্ত নিয়ম ভেঙে রাতারাতি নোট বাতিল করার মধ্যেই দেশের কল্যাণ, এ হেন ডাহা মিথ্যাকেও বহু মানুষের কাছে সাময়িক ভাবে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য করপোরেট পুঁজি মালিকদের বড় অংশ মোদি সাহেবের পাশে দাঁড়িয়েছে।

দিন যত গড়িয়েছে, দেশের মানুষ একটু একটু করে বুঝতে শুরু করেছে এসবই গালগল্প মাত্র। চাষির আয় দ্বিগুণ হওয়া তো অনেক দূরের কথা, চাষের খরচটুকু তোলার মতো ফসলের ন্যূনতম মূল্যের ব্যবস্থা সরকার করেনি। ঋণের ফাঁদে হাঁসফাঁস করা কৃষক পরিবারের আর্তনাদে দেশের বাতাস ভারী হয়ে গেছে। প্রতিদিন আত্মঘাতী কৃষকের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী বেটি বাঁচাবেন কি, তাঁর শাসনকালে নারী নির্যাতন সর্বকালীন রেকর্ডকে ছাপিয়ে গেছে! দু'কোটির জায়গায় বছরে দু'লক্ষ বেকারেরও কাজ হয়নি। মোদি শাসনে যতজন কাজ পেয়েছেন, কাজ হারিয়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশি। নোট বাতিলের ধাক্কায় সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ছোট ব্যবসায়ীরা যখন কপর্দকশূন্য হওয়ার পথে, বিজেপি তথা সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদধন্য মেহুল চোকসি, নীরব মোদি প্রমুখ বৃহৎ ব্যবসায়ীরা ভারতীয় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা মেরে দিয়ে বহাল তবিয়তে বিদেশের নাগরিকত্ব নিয়েছে বিজেপি সরকারের মদতেই। বিজেপির আর এক আশীর্বাদধন্য সাংসদ বিজয় মাল্যও একই পথের পথিক হয়েছেন। 'দেশের চৌকিদার' বলে যে প্রধানমন্ত্রী নিজের পিঠ চাপড়াতেন, তাঁর দল এবং সরকারের মদতেই শিল্পপতিরা ঋণের নামে কার্যত ব্যাঙ্ক লুঠ চালিয়ে যাচ্ছে। রাফাল কেলেঙ্কারিতে প্রধানমন্ত্রী ঘনিষ্ঠ শিল্পপতিদের পিঠ বাঁচাতে সুপ্রিম কোর্টকে পর্যন্ত ভুল তথ্য দিয়েছে বিজেপি সরকার। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে সিবিআই কোনও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের স্বাধিকার সরকার রক্ষা করেনি, সর্বত্রই নগ্ন দলবাজি আর গৈরিকীকরণের নজির গড়েছে।

সব দেখে দেশের মানুষ বুঝতে শুরু করেছেন, বিজেপির সুচতুর কূটকৌশলের শিকার তাঁরা। ২০১৪-র কংগ্রেস বিরোধী জনরোষকে পুঁজি করে সংকট মোচনের মসীহা সাজা নরেন্দ্র মোদি যে কংগ্রেসের থেকে আলাদা কোনও আর্থিক নীতি নিয়ে চলেননি তা অনেকটাই ধরা পড়ে যায় মানুষের চোখে। উন্নয়নের ঝুলির শতচ্ছিন্ন চেহারাটা বে-আব্রু হয়ে যাওয়ায় বিজেপি তথা নরেন্দ্র মোদি বার করেছেন তাঁদের ধর্মের ভেক, আস্তিনে লুকানো উগ্র হিন্দুত্বের তাস। বিজেপির মদতে শুরু হয়েছে গো-রক্ষার নামে একের পর এক মানুষকে হত্যা। উগ্র জাতীয়তাবাদের ধুয়ো তুলে মানুষের বিচারবুদ্ধি গুলিয়ে দেওয়ার জন্য নানা কার্যসূচি চলেছে। চলেছে বিজেপি এবং তাদের আদর্শগত চালক আরএসএস বিরোধী যুক্তিবাদী লেখক, সাংবাদিকদের পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে একটা আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা। সব অস্ত্র প্রয়োগ করেও যখন মানুষের মন পাচ্ছে না বিজেপি সেই সময় তারা তূণ থেকে বার করেছে তাদের রামমন্দির অস্ত্র। ধ্বংস করা বাবরি মসজিদের স্থানেই রামমন্দির চাই, এই দাবিতে আবার লম্ফ ঝম্প শুরু করেছে বিজেপি-আরএসএস। কিন্তু পেট বড় বালাই। ধর্মপ্রাণ মানুষ, যাঁদের একটা বড় অংশকে বিজেপি ১৯৯২ সাল কিংবা ২০১৪ সালে মন্দিরের নামে পাগল করে তুলতে পেরেছিল তাঁদের অধিকাংশই এবারে মন্দিরের হুঙ্কার শুনে বলেছেন, আগে কাজ, পেটে ভাত-রুটি তারপর ভাবব মন্দিরের কথা। উত্তরপ্রদেশের ফৈজাবাদ শহরের নাম পাল্টে অযোধ্যা করেও বিজেপি উন্মাদনার পরিবেশ তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে। বিজেপি প্রস্তাবিত রাম মন্দিরের অদূরে দাঁড়িয়েই সাংবাদিকরা শুনেছেন, 'মন্দির এক ভোট কা মুদ্দা হ্যায়।' অর্থাৎ ভোট এলেই মন্দিরের কথা মনে পড়ে বিজেপির। রাজ্যে রাজ্যে রথযাত্রা, রামযাত্রা এমন নানা সার্কাস করেও বিজেপি নেতারা মানুষের এই ক্ষোভের ঝড়কে রুখতে পারেননি।

এই পরিস্থিতিতে বিজেপি বিরোধী বিক্ষোভের সুবিধা পেয়েছে কংগ্রেস। কিন্তু কংগ্রেস জিতেছে মানেই কি মানুষ তাকে চেয়েছে বলতে হবে? তিন রাজ্যে কংগ্রেসের জয়ের প্রধান কারণ বিজেপি বিরোধী বিক্ষুব্ধ মানুষের সামনে প্রকৃত বিকল্পের অভাব। বিজেপি যে অস্ত্র ব্যবহার করতে চেয়েছিল এবারের ভোটে সেই অস্ত্রই কংগ্রেস ব্যবহার করেছে বিজেপির বিরুদ্ধে। তাই কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী থেকে শুরু করে তাদের ছোট-বড় নেতারা উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ইত্যাদি নিয়ে শব্দ খরচ করেছেন অতি সামান্য। রাহুল গান্ধী যেন মোদির সাথে মন্দিরে মন্দিরে ছুটে বেড়ানোর প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন। কে বড় হিন্দু এই প্রতিযোগিতায় বারবার নিজের পৈতে দেখিয়ে হিন্দুত্বের আবেগে সুড়সুড়ি দিয়েছেন রাহুল গান্ধী। বিজেপির সাথে কংগ্রেসের হিন্দুত্বের পাল্লা দেওয়ার এই রাজনীতির জন্যই এবারের ভোটে মানুষের সমস্যা ছেড়ে হনুমানের জাত বিচার থেকে নেতাদের গোত্র বিচারই হয়ে উঠল যেন প্রধান ইস্যু! বিজেপির গো-রাজনীতির প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস গোশালা করারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ইস্তাহারে। ফলে কংগ্রেসের জয় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জয় বলে দেখানো চলে না। তেমনই বলা চলে না বিজেপির জনবিরোধী আর্থিক নীতির বিরুদ্ধে যে রায় মানুষ দিল, তা শিরোধার্য করে কংগ্রেস যথার্থ জনমুখী নীতি আনবে।

আজকের দিনে বুর্জোয়া গণতন্ত্রে নির্বাচন মানেই বুর্জোয়াদের পছন্দমতো নির্বাচন। বস্তুত একচেটিয়া মালিকদের ইচ্ছাই নানা ভাবে জনগণের ইচ্ছা বলে সামনে আনা হয়। তাদের টাকার জোরই প্রচার, প্রশাসনিক আনুকূল্য, পেশি-শক্তি, ভোট কেনা, রিগিং মেশিনারি, এই সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে। এ দেশের একচেটিয়া মালিকরা আগের মতো ঐক্যবদ্ধভাবে যে বিজেপির পাশে থাকছে না তার ইঙ্গিত নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই পাওয়া যাচ্ছিল। পুঁজিবাদী বাজারের সংকট দিনে দিনে এতটাই তীব্র হয়েছে যে, সংকুচিত বাজারের ভাগ পেতে একচেটিয়া পুঁজির কাড়াকাড়ি মারাত্মক আকার নিয়েছে। কোনও ক্ষেত্রে একচুল জমিও পরস্পরকে ছাড়তে তারা রাজি নয়। নিজেদের এই লড়াইতে ভারতীয় ধনকুবেরদের একটা শক্তিশালী অংশ বিজেপির পাশেই দাঁড়ালেও আর এক অংশ প্রকাশ্যেই কংগ্রেসকে মদত দিয়েছে। একচেটিয়া পুঁজি মালিকদের এই ভূমিকা কংগ্রেসকে সুবিধা করে দিলেও জনস্বার্থের সাথে তার সম্পর্ক কী?

যখন দেশের সাধারণ মানুষ-শ্রমিক-কৃষকের ক্ষোভ ফেটে পড়তে চাইছে। বহু স্থানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ শুধু রাস্তায় নামছে তাই নয়, পুলিশের গুলির সামনে পর্যন্ত দাঁড়াচ্ছে। এই নির্বাচনে দেখা গেল বিজেপির গো-রাজনীতি-রাম মন্দির হুঙ্কার পর্যন্ত পেটের ভাতের দাবি, জীবন-জীবিকার দাবির কাছে ম্লান হয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, একচেটিয়া মালিকতোষণের রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রকৃত বিকল্প কী হতে পারে? দেশজোড়া বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলনই নয় কি?

কিন্তু সেই বিকল্প গড়ে তোলার কাজটি নিছক কিছু ভোটের হিসাবের বিষয় নয়। কয়েকটা এমএলএ-এমপি লাভের কৌশল চরিতার্থ করতে যে কোনও জোট করা কিংবা, কংগ্রেসের হাত শক্তিশালী করার মধ্য দিয়ে এই বিকল্প গড়ে উঠতে পারে না। বিজেপির বিকল্প হিসাবে কংগ্রেসকে তুলে ধরাটা বুর্জোয়া প্রভুদের কৌশল। শাসক শ্রেণির তাঁবেদার একটা দল জনপ্রিয়তা হারালে গণতন্ত্রের নামে বুর্জোয়া শ্রেণি তাদের সেবাদাস আর একটি দলকে ক্ষমতায় আনে। দ্বিদলীয় বুর্জোয়া রাজনীতির এই চক্করে পড়ে তাঁতের মাকুর মতো মানুষ একবার এদিক আর একবার ওদিকে যায়— ভাবে, এই শোষণ-যন্ত্রণার অবসান হবে। কিন্তু শোষণ আরও চেপে বসে। বিজেপি বিরোধী বিক্ষোভকে কংগ্রেসের দিকে নিয়ে যেতে বুর্জোয়া শাসকরা তাই প্রচারের আলো এখন কংগ্রেসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সত্যিকারের বামপন্থীরা সাধারণ মানুষকে সেই মায়াময় আলোতে মোহগ্রস্ত হতে দিতে পারে না।

এই পরিস্থিতিতে শুধু ভোটে নয়, বিজেপির মতো সাম্প্রদায়িক শক্তিকে আদর্শগত ভাবে পরাজিত করতে হবে। তা করতে হলে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলাটাই রাস্তা। তাতে সামিল করতে হবে বাম-গণতান্ত্রিক মনোভাবাসম্পন্ন সকল মানুষকে। একচেটিয়া মালিকের দল কংগ্রেস কখনও এই আন্দোলনের শক্তি হতে পারে না। বিজেপি এবং কংগ্রেস এই দুই শক্তির বিরুদ্ধেই লড়তে হবে খেটে খাওয়া মানুষকে।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি)-র দমদম শাখার প্রবীণ কর্মী কমরেড শুভ্রা রায় ২২ নভেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর।

১৯৬০-এর দশকে যখন তিনি বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রী সংসদের সাধারণ সম্পাদিকা ছিলেন সেই সময় কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রীদের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে টাকা আদায় করছিল। ওই কলেজের অধ্যাপিকা কমরেড মেনকা বসু রায়ের সাহচর্যে তিনি ছাত্রীদের সংগঠিত করে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। ওই সময় তিনি দলের সংস্পর্শে আসেন।

দলের নীতি-আদর্শ, উন্নত রুচি-সংস্কৃতি তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। নেতাদের আকর্ষণে তাঁদের সাহচর্য পাওয়ার জন্য সুযোগ পেলেই ছুটে যেতেন। দলের পত্রপত্রিকা বিক্রি, তহবিল সংগ্রহ, ঐতিহাসিক ভাষা-শিক্ষা আন্দোলন, ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন, প্রাথমিকে ইংরেজি ও পাশ-ফেল চালুর দাবিতে বাংলা বনধ সহ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ পরিচালিত বৃত্তি পরীক্ষার কাজে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এই প্রক্রিয়ায় তিনি দলের সদস্যপদ লাভের যোগ্যতা অর্জন করেন। গত কয়েক বছর নানা অসুখের কারণে দলের দৈনন্দিন কাজে নিজেকে যুক্ত রাখতে না পারলেও দলের পত্র-পত্রিকা পড়তেন, কর্মীদের খোঁজখবর রাখতেন। সম্প্রতি কেরলের ভয়াবহ বন্যার খবর শুনে নিজ উদ্যোগে ত্রাণ সংগ্রহ করে দলের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ৯ ডিসেম্বর তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

কমরেড শুভ্রা রায় লাল সেলাম

এস ইউ সি আই (সি) দলের আসানসোল লোকাল কমিটির একনিষ্ঠ কর্মী কমরেড লুলু সয় ২৪ নভেম্বর নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৪ বছর। তাঁর অকস্মাৎ মৃত্যুতে সকলের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে অসে। তিনি ঝাড়খণ্ডের সিংভূম জেলার বর্তমান জেলা সম্পাদক কমরেড বিমল দাসের মাধ্যমে দলের সংস্পর্শে আসেন। কমরেড শিবদাস ঘোষের বিভিন্ন রচনা, দলের হিন্দি পত্রিকা প্রভৃতি নিয়মিত পাঠের মাধ্যমে কমরেড লুলু সয় দলের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন ও কাজ শুরু করেন। ঝাড়খণ্ডের ডুমুরিয়াতে তিনি গরিব ঘরের সন্তানদের জন্য একটি অবৈতনিক স্কুল গড়ে তুলেছিলেন, যা আজও ওই এলাকার মানুষ পরিচালনা করছেন। চাকরিসূত্রে তিনি আসানসোলে আসেন এবং রেলে চাকরির সুবাদে রেলশ্রমিকদের মধ্যেও সংগঠন বিস্তারে উদ্যোগী হন। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন সম্ভাবনাময় কর্মীকে হারাল।

২ ডিসেম্বর আসানসোল মাইনস বোর্ড অব হেলথ-এর সেমিনার হলে প্রয়াত কমরেড লুলু সয় স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত হয়ে মাল্যদান করেন সিংভূম জেলা সম্পাদক কমরেড বিমল দাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড রতন কর্মকার, পশ্চিম বর্ধমান জেলা সম্পাদক কমরেড সুন্দর চ্যাটার্জী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও সমর্থকবৃন্দ।

কমরেড লুলু সয় লাল সেলাম

মালিকদের কর ছাড় দিতে টাকার অভাব হয় না অভাব হয় কৃষকদের ঋণ মকুবে

মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়— তিনটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির পরাজয়ের অন্যতম কারণ কৃষকদের তীব্র ক্ষোভ। যদিও এই ক্ষোভ নতুন কিছু নয়। দীর্ঘ কংগ্রেস শাসনে কৃষকরা বঞ্চিতই থেকে গেছে। সেই ক্ষোভ নিরসনের প্রতিশ্রুতি দিয়েই ক্ষমতায় বসেছিল বিজেপি। কিন্তু ২০২২ সালের মধ্যে চাষিদের আয় দ্বিগুণ করে দেওয়ার মতো কিছু অলীক প্রতিশ্রুতি ছাড়া কাজের কাজ কিছুই করেনি তারা। ফলে কৃষকদের ক্রোধ কমেনি, বরং বেড়েছে। সুযোগ বুঝে আসরে নেমে পড়ে কংগ্রেস। কল্পতরু সেজে প্রতিশ্রুতি বিলোতে থাকে— 'আমাদের ভোট দিলে ফসলের ন্যূনতম দাম পাবে', 'সব ঋণ মকুব করা হবে' ইত্যাদি। পুঁজিপতিদের পরিচালিত সংবাদমাধ্যম বিজেপির একমাত্র বিকল্প হিসাবে তাদেরই আরেকটি বিশ্বস্ত দল কংগ্রেসকে তুলে ধরে। সেই প্রচারে প্রভাবিত কৃষক-জনতা আবার বাধ্য হয় কংগ্রেসকে ভোট দিতে। কৃষকরা যে তাঁদের অসহনীয় দুরবস্থা থেকে রেহাই চান, বিজেপির অপশাসনের পরিবর্তন চান এই ঘটনায় তা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হল। কিন্তু রাজনৈতিক সচেতনতার অভাবে তাঁরা ধরতে পারলেন না যে এর দ্বারা তাঁরা উত্তপ্ত কড়াই থেকে লাফিয়ে জ্বলন্ত উনুনে পড়লেন। তাঁদের জীবনের সমস্যার সমাধান এই সরকার পরিবর্তনের দ্বারা হবে না।

সামনেই লোকসভা নির্বাচন। বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির দুর্গতির পর কৃষকদের মন পেতে শুরু হয়েছে 'কৃষক দরদি' সাজার কাড়াকাড়ি। গত চার বছরে প্রধানমন্ত্রী সহ বিজেপি নেতাদের এই কৃষকদের কথা মনে পড়েনি। তাদের দুরবস্থা, আত্মহত্যার মিছিল এই রাজনীতির ব্যবসায়ী নেতা-মন্ত্রীদের মনে এতটুকু দাগ কাটতে পারেনি। এখন লোকসভা ভোটে পরাজয়ের আশঙ্কায় তাঁদের মনে কৃষক দরদের বান ডেকেছে। এই তিনটি রাজ্যে নতুন কংগ্রেস সরকারের পাশাপাশি কেন্দ্রে বিজেপি সরকারও ভাব দেখাতে শুরু করেছে, তারাও ঋণ মকুবের পক্ষে।

চাপে পড়ে এখন চাষির ঋণ মকুবের প্রশ্নটি আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠতেই কোনও কোনও মহল থেকে রে রে আওয়াজ উঠতে শুরু করেছে। বলা হচ্ছে, সরকার কৃষিঋণ মকুব করলে রাজস্ব ঘাটতির পরিমাণ বাড়বে। অনেক 'বিশেষজ্ঞ' আবার তথ্য দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন তা জিডিপির কত শতাংশ। অথচ সরকার যখন পুঁজিপতিদের লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা করছাড় দেয় তখন এরা টুঁ-শব্দও করে না। ব্যাঙ্ক কর্তারা ধুয়ো তুলতে শুরু করেছেন, এতে নাকি বোঝা বাড়বে ব্যাঙ্কগুলির। যেন সরকার ঋণ মকুব করলে, তা ব্যাঙ্কগুলি তাদের নিজেদের ভাণ্ডার থেকে মেটাবে। বাস্তবে সরকারই তা ব্যাঙ্কগুলিকে মিটিয়ে দেবে। পুঁজিপতিরা যখন হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ শোধ না করেও আবার ঋণ নেয়, তখন এই সব কর্তাদের এমন কাঁদুনি গাইতে দেখা যায় না। কোনও কোনও কর্তা আবার বলেছেন, এতে কৃষকদের ঋণ শোধের অভ্যেস নষ্ট হয়ে যাবে। এই মুহূর্তে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে ব্যাঙ্কগুলিতে পুঁজিপতিদের শোধ না করা ঋণের ঘোষিত পরিমাণ প্রায় ১২ লক্ষ কোটি টাকা। এতে বোধহয় পুঁজিপতিদের অভ্যেস নষ্ট হয় না? ব্যাঙ্ককর্তারা কিন্তু একবারও সেই প্রশ্ন তোলেন না। কী বিরাট সব নীতি-বিশারদরা বসে রয়েছেন ব্যাঙ্কগুলির মাথায়! জনগণের কষ্টার্জিত করের টাকায় এদেরই প্রতি মাসে লক্ষ লক্ষ টাকা বেতন দিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে। পুঁজিপতিদের সেবা করতে করতে এঁরা তাঁদের এমন ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছেন যে, চাষিরা গোটা জাতির খাদ্য জোগায় তারা দেনার দায়ে প্রতি বছর হাজারে হাজারে আত্মহত্যা করলেও তা তাঁদের চোখেই পড়ে না। যেন তারা পুঁজিপতিদের মতো ইচ্ছা করে ঋণ শোধ করে না, তারপর মনের আনন্দে আত্মহত্যা করে!

অর্থনীতির বিশেষজ্ঞ বলে খ্যাত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন কর্তা রঘুরাম রাজন আবার গরিব কৃষকদের প্রতি দরদে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি লিখে ফেলেছেন যাতে ঋণ মকুবের বিষয়টি আলোচনার চৌহদ্দিতেই আসতে না দেওয়া হয়। তিনি বলেছেন, এই ধার অনেক সময়ই গরিব চাষির কাছে পৌঁছয় না। হতে পারে তাঁর কথা ঠিক। কিন্তু তা হলে দাবিটা তো হবে যে, গরিব চাষিরাও যাতে ব্যাঙ্কঋণ পায় তার ব্যবস্থা কর। চাষি যাতে ফসলের ন্যায্য দাম পায় তার ব্যবস্থা কর, সেচ ব্যবস্থার প্রসার ঘটাও, বিদ্যুৎ সার বীজ সস্তা কর, এসব নিয়ে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মুনাফা করা বন্ধ কর, যাতে তাকে ঋণ নিতে না হয়। কিন্তু তিনি কিংবা তাঁর সম্প্রদায় তেমন দাবি না করে ঋণ মকুবেরই পুরো বিরোধিতা করলেন। এই সব আমলারা তো শেষ পর্যন্ত পুঁজিপতিদের স্বার্থেরই রক্ষক। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের অন্যতম স্তম্ভ এই আমলাতন্ত্র। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁরা এত বড় একটি সমস্যাকে মালিকদের চোখেই দেখছেন এবং বিচার করছেন। এর সাথে রয়েছে বুর্জোয়া প্রচারমাধ্যমগুলির মিথ্যা প্রচার, যা এমনকী বহু সাধারণ মানুষকেও বিভ্রান্ত করে ফেলে যাতে তারা বিশ্বাস করে, কখনও এমন করে ঋণ মকুব করা উচিত নয়।

বাস্তবে শাসক দলগুলি এই ঋণমকুবের স্লোগান তুলেছে সংকটগ্রস্ত চাষিদের জীবনে কোনও স্থায়ী সুরাহার জন্য নয়, শুধুমাত্র ভোটে কৃষকদের সমর্থন পাওয়ার জন্য। বিগত ৭০ বছর ধরে এ জিনিসই চলে আসছে। না হলে তারা কৃষকদের সমস্যাগুলি নিয়ে আগেই ব্যবস্থা নিত। কৃষকদের তাদের দাবিগুলি নিয়ে বারে বারে আন্দোলনে ফেটে পড়তে হত না। তারা কখনও লং মার্চ করেছে, কখনও দিল্লিতে ধরনা দিয়েছে। মধ্যপ্রদেশের মন্দসৌরে এমনই এক বিক্ষোভে গত বছর বিজেপি সরকারের পুলিশ গুলি চালিয়ে পাঁচ জন কৃষককে হত্যা করেছিল। বিজেপি শাসিত মহারাষ্ট্রের পেঁয়াজ চাষিদের আত্মহত্যা এখন প্রতিদিনের ঘটনা। কিন্তু কৃষিপ্রধান এই রাজ্যগুলিতেও ব্যাপক সংখ্যায় কৃষকরা আত্মহত্যা করছে। সরকারি পরিসংখ্যানই বলছে, মধ্যপ্রদেশে ২০০৪ থেকে ২০১৬-র মধ্যে ১৬,৯৩২ জন চাষি আত্মহত্যা করেছে। যার অর্থ দিনে গড়ে তিন জনেরও বেশি। ছত্তীসগড়েও এই ১২ বছরে ১২,৯৭৯ জন চাষি আত্মহত্যা করেছে। রাজস্থানে ওই সময়ে কৃষক আত্মহত্যার সংখ্যা সাড়ে পাঁচ হাজারের বেশি। স্বাভাবিক ভাবেই বিজেপি শাসনের বিরুদ্ধে কৃষকদের ক্ষোভ তুঙ্গে উঠেছিল এবং তা এতখানি যে বিজেপি নেতাদের 'মন্দির ওহি বনায়েঙ্গে' স্লোগান তাতে এতটুকুও জল ঢালতে পারেনি। এরই ফলে কৃষি অধ্যুষিত বহু এলাকায় বিজেপি নেতারা প্রচারে যাওয়ারও সাহস দেখাননি। কোথাও কোথাও কৃষকরা তাড়া করে এলাকাছাড়া করেছে বিজেপি নেতাদের।

স্বাধীনতার ৭০ বছরে কৃষকদের মূল সমস্যাগুলির দিকে নজর দেয়নি কোনও সরকার। সার, বীজ, কীটনাশক, সেচের জন্য প্রয়োজনীয় ডিজেলের দাম বেড়েছে লাফিয়ে। খরা-বন্যায় জর্জরিত হয়ে, ফসলের ন্যায্য দাম না পেয়ে, ঋণের বোঝা সইতে না পেরে আত্মহত্যার মিছিল তো সেই কংগ্রেস আমল থেকেই চলছে। গত কয়েক বছরে এই আত্মহত্যার পরিমাণ আরও বেড়েছে। যে নেতারা আজ ঋণ মকুবের প্রতিশ্রুতির গাজর কৃষকদের সামনে ঝোলাচ্ছেন, বছরের পর বছর কঠোর পরিশ্রম করে চাষ করার পরও কেন পরের বার চাষের জন্য তাদের ঋণ নিতে হয়, এ প্রশ্নের জবাব সেই নেতারা দেন না। ভোটের মুখে আজ তাঁরা কৃষক দরদি সাজছেন, অথচ তাঁদের কৃষক বিরোধী নীতিই কৃষকদের এই দুরবস্থার জন্য দায়ী। তাদের উদারীকরণ তথা একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থরক্ষাকারী নীতির কারণেই সারের দাম আজ আকাশছোঁয়া, বীজ কৃষকদের হাত থেকে চলে গেছে বহুজাতিক কোম্পানিগুলির হাতে। বিপুল পরিমাণ ট্যাক্স চাপিয়ে ডিজেলের দামে আগুন লাগিয়েছে তো এই দলগুলিই। কৃষি পণ্যের বাজার আজ একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মুঠোয়। তাদের স্বার্থের দিকে লক্ষ রেখেই কৃষিপণ্যের আমদানি-রফতানি নীতি ঠিক হয়। তারই পরিণতিতে শুধু নাসিকের পিঁয়াজ চাষিরা নয়, আলু, টমেটো, লঙ্কা, তুলো— সব ধরনের চাষিরাই আত্মহত্যা করছে! ফড়ে, আড়তদার, কালোবাজারি এবং একচেটিয়া পুঁজিপতির দল কীভাবে চাষিকে শুষে নিয়ে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিচ্ছে, বিজেপি-কংগ্রেস নির্বিশেষে সব দলের সরকারই তা ঠায় দাঁড়িয়ে দেখে, কোনও ব্যবস্থা নেয় না। কারণ এই সব ব্যবসায়ী-কালোবাজারিরাই তাদের নির্বাচনের খরচ চালানোর, দল চালানোর, বিলাস-ব্যসনে নবাবী জীবন যাপনের খরচ জোগায়।

আসলে শ্রমিক শ্রেণির মতো কৃষকদেরও তারা দুরবস্থার মধ্যেই ফেলে রাখতে চায়। একের পর এক নির্বাচনে তাদের দুরবস্থাই তো এই সব রাজনীতির ব্যবসায়ীদের, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের পলিটিক্যাল ম্যানেজার রাজনৈতিক দলগুলির পুঁজি। ভোটের আগে এই দুরবস্থা থেকে রেহাইয়ের লোভ দেখানো আর ক্ষমতায় বসে এদের আরও নিংড়ে নেওয়ার বন্দোবস্ত করা— এই তো তাদের রাজনীতি। পুঁজিবাদী এই ব্যবস্থা যতদিন টিকে থাকবে, পাঁচ বছর অন্তর এই একই নাটকের পুনরাভিনয় চলতে থাকবে। পুঁজিপতিদের সেবাদাস এই দলগুলির পক্ষে আজ আর কৃষকদের দুরবস্থা দূর কর সম্ভব নয়। এদের কাছ থেকে সামান্য কিছু দাবিও আদায় করতে হলে দরকার সংগঠিত কৃষক আন্দোলন এবং তা হওয়া দরকার সঠিক নেতৃত্বে। না হলে সেই আন্দোলনের ফল আত্মসাৎ করবে বুর্জোয়াদেরই কোনও একটি দল এবং তাকে টেনে নিয়ে যাবে সেই নির্বাচনের অন্ধ গলিতে।

প্যারিসে শান্তি সম্মেলন নেকড়েদের মুখে শান্তির বাণী

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার একশো বছর পূর্তি উপলক্ষে ১১ নভেম্বর ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে শান্তি সম্মেলনে যোগ দিতে সমবেত হয়েছিলেন ৭১টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সহ জার্মানি, ফ্রান্স, ব্রিটেনের মতো সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির প্রতিনিধিরা। ভণ্ডামির সমস্ত সীমা অতিক্রম করে উপস্থিত দর্শকদের সামনে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রবল ঘৃণা বর্ষণ করেছেন তাঁরা। এক কদম এগিয়ে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট মাকরঁ 'শান্তির লক্ষ্যে যুদ্ধ' জারি রাখতে একটি 'শান্তি ফোরাম' গঠনের পরিকল্পনাও ঘোষণা করেছেন।

সম্মেলনে যে দেশগুলির প্রধানরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে চোখের জল ঝরিয়েছেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়েছিল সেইসব দেশের শাসকরাই। কে কত বেশি সংখ্যক উপনিবেশে দখলদারি কায়েম করে লুটপাট চালাবে তারই প্রতিযোগিতায় বিশ্বযুদ্ধে সামিল হয়েছিল একদিকে ফ্রান্স, ব্রিটেন, রাশিয়া, আমেরিকা সহ আরও কয়েকটি দেশের জোট, অন্যদিকে জার্মানি, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি ও ইটালির জোট। এই যুদ্ধ শুরুর আগে নিজের নিজের উপনিবেশগুলির সাধারণ মানুষের উপর দীর্ঘদিন ধরে চরম শোষণ-নিপীড়ন চালিয়ে এসেছে ব্রিটেন, ফ্রান্স সহ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শাসকরা। আমেরিকা হাত রাঙিয়েছে ওই মহাদেশের আদি বাসিন্দাদের রক্তে।

আজও বন্ধ হয়নি সেই রক্তস্নান। সাম্রাজ্যবাদী মুনাফার স্বার্থে গোটা বিশ্ব জুড়ে দেশে দেশে হানাদারি চালিয়ে যাচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সহ ফ্রান্স, ব্রিটেন, জার্মানির মতো দেশগুলি। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি রিপোর্টে সামনে এসেছে একটি ভয়ঙ্কর তথ্য। দেখা যাচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ শুধু ইরাক, আফগানিস্তান আর পাকিস্তানে তথাকথিত 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে' প্রাণ কেড়ে নিয়েছে ৫ লক্ষেরও বেশি নিরীহ মানুষের। তাও এই রিপোর্টে সিরিয়ায় মার্কিন হানাদারিতে নিহত ৫ লক্ষাধিক মানুষের হিসাব নেই। ইয়েমেনে দীর্ঘদিন ধরে হামলা চালিয়ে অসংখ্য মানুষকে হত্যা করে চলেছে যে সৌদি আরবের শাসক শ্রেণি, তাকে সাম্রাজ্যবাদী মুনাফার স্বার্থে আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্স লাগাতার অস্ত্রসাহায্য করছে। এরাই আজ এসেছে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতিতে চোখের জল ঝরাতে! প্যারিসের এই 'শান্তি' সম্মেলনে সাম্রাজ্যবাদী নরহত্যাকারীদের এই ভড়ং পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকল মানুষের বুকে প্রবল ঘৃণার সঞ্চার করেছে।

তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলে শান্ত জয়নগরে অশান্তি

জয়নগরে ১৩ ডিসেম্বর এক খুনের ঘটনা প্রসঙ্গে জয়নগরের প্রাক্তন বিধায়ক এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক তরুণ নস্কর বলেন, "পেট্রোল পাম্পের কাছে যে খুনের ঘটনা ঘটেছে তা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। তৃণমূলের মধ্যে তীব্র গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলে এই ঘটনা ঘটল। রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও জয়নগরে সাধারণ মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির সম্পর্ক ছিল। কিন্তু তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠী কোন্দলকে যেভাবে রাস্তায় একের পর এক খুনের রাজনীতিতে নামিয়ে এনেছে, তাতে এলাকার সুস্থ পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। এর আগেও খুনের ঘটনা ঘটেছে। প্রশাসনকে আমরা বারবার জানিয়েছি। কিন্তু কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় এমন ঘটনা চলছেই। আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি ও প্রশাসনকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।"

থানায় স্মারকলিপি ঃ ১৭ ডিসেম্বর কমরেডস তরুণ নস্কর, সুজাতা ব্যানার্জী, গোবিন্দ হালদার প্রমুখের এক প্রতিনিধি দল জয়নগর থানায় ডেপুটেশন দিয়ে খুনিদের শাস্তির ও এলাকায় দ্রুত শান্তি ফিরিয়ে আনার দাবি জানান।

পিসিএ-র সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী অনুষ্ঠান

বারাসাত ঃ প্রোগ্রেসিভ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের (পিসিএ) উত্তর ২৪ পরগণা জেলার পক্ষ থেকে ৯ ডিসেম্বর বারাসাত স্টেশনে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। গান, কবিতা, কথায় অংশগ্রহণ করেন আগরপাড়া অগ্নিবীণা, অন্যধারা, শ্যামনগর মনীষী স্মরণ মঞ্চ, ভাটপাড়া মুক্ত আকাশ, সাহিত্য ও বিজ্ঞান পত্রিকা কম্পাস ও বীক্ষণের সঙ্গে যুক্ত সাংস্কৃতিক কর্মীরা। বক্তব্য রাখেন পিসিএ-র রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে গৌতম ঘোষ, নাট্যকর্মী ও পিসিএ জেলা ইনচার্জ অমল সেন এবং কম্পাস পত্রিকার সম্পাদক দেবাশিস ব্যানার্জী। উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তির দ্বারা ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ধ্বংসের প্রতিবাদে ধর্মীয় বিভেদ নীতি বিরোধী এই সভায় এলাকার নাগরিক ও পথচলতি সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

কলকাতার হাজরা মোড়ে পিসিএ-র উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বেলদা ঃ পিসিএ-র পশ্চিম মেদিনীপুর বেলদা শাখার উদ্যোগে ১০ ডিসেম্বর গান্ধী পার্কে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী কবিতা, কোরাস গান, রণপা নৃত্য, সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী গল্প, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিষয়ক চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি। উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক বিভূতি দে, শিক্ষক প্রদীপ দাস, তপনেশ দে, অনন্ত জানা, পরেশ বেরা, কণ্ঠশিল্পী সবিতা জানা প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন পিসিএ-র বেলদা শাখা সম্পাদক ডাঃ মানস কর।

ক্ষুদিরাম স্মরণে শিশু কিশোর শিবির

১৬ ডিসেম্বর ফালাকাটার সুভাষ পল্লী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল শিশু কিশোর শিবির। ক্ষুদিরাম স্মরণে এই শিবিরে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান খেলাধূলা ইত্যাদি হয়। উপস্থিত ছিলেন দলের কোচবিহার জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মণি নন্দী। কমসোমলের রাজ্য ইনচার্জ কমরেড সপ্তর্ষী রায়চৌধুরী এবং পার্টির কোচবিহার জেলা কমিটির সদস্য কমরেড পীযূষকান্তি শর্মা শিবিরে নানা বিষয়ে আলোচনা করেন।

ময়নায় অ্যাবেকার সম্মেলন

কয়লার দাম ৪০ শতাংশ, জিএসটি ৭ শতাংশ এবং কারিগরি-বাণিজ্যিক ক্ষতি কমার কারণে বিদ্যুতের দাম ৫০ শতাংশ কমানো, লো ভোল্টেজ বন্ধ, সমস্ত খারাপ মিটার পাল্টানো, কৃষি বিদ্যুতের স্থায়ী পরিকাঠামো গড়ে তোলা সহ ৭ দফা দাবিতে ১৬ ডিসেম্বর অ্যাবেকার পূর্ব মেদিনীপুরের ময়না থানা কমিটির ডাকে গড়ময়না প্রাইমারি স্কুলে বিদ্যুৎগ্রাহকদের ময়না থানা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন কমিটির সভাপতি মৃগেন্দ্রনাথ প্রামাণিক। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সভাপতি অধ্যাপক জয়মোহন পাল সহ নারায়ণ চন্দ্র নায়ক প্রমুখ। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন থানা কমিটি সম্পাদক মদন সামন্ত। উপস্থিত ছিলেন শতাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহক। সম্মেলন থেকে মৃগেন্দ্রনাথ প্রামাণিককে সভাপতি, মদন সামন্তকে সম্পাদক করে নতুন ময়না থানা কমিটি গঠিত হয়।

সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দিবসে দিল্লিতে ধরনা

৬ ডিসেম্বর, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দিবসে এসইউসিআই(সি)-র দিল্লি রাজ্য সংগঠনী কমিটির উদ্যোগে পার্লামেন্ট স্ট্রিটে সারাদিন ব্যাপী ধরনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন রাজ্য সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রাণ শর্মা। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন রাজ্য কমিটির অন্যান্য সদস্যরা। সভাপতিত্ব করেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড আর কে শর্মা।

সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সপ্তাহ পালিত

একের পাতার পর

মিছিলের শুরুতে বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অচিন্ত্য সিনহা। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নভেন্দু পাল, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেডস তপন ভৌমিক, শিশির সরকার, গৌতম ভট্টাচার্য ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। মিছিলে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি থেকে সহস্রাধিক কর্মী-সমর্থক অংশগ্রহণ করেন।

কলকাতার লেনিন মূর্তি থেকে বিশাল মিছিল রাজাবাজার পর্যন্ত যায়। নেতৃত্ব দেন দলের পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য সহ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ। পাঁচ হাজারের বেশি মানুষের এই সুসজ্জিত মিছিল মানুষকে প্রভাবিত করে। মিছিল দেখে অভিভূত একজন সাধারণ মানুষ ছুটে এসে মিছিলের নেতৃবৃন্দের হাতে ৫০০ টাকা দিয়ে যান। তিনি বলে যান, আপনারা এমন এক মিছিল করেছেন বলে অভিনন্দন রইল। রাজাবাজারে মিছিলের শেষে সভায় বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অনুরূপা দাস, কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। কলকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড জুবের রব্বানি উর্দুতে বক্তব্য রাখেন।

কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য তাঁর বক্তব্যে বলেন, নিকৃষ্ট ভোট রাজনীতির স্বার্থে বিজেপি সাম্প্রদায়িকতাকে দেশে ছড়াচ্ছে। তার সাথে সাধারণ মানুষের ধর্ম বিশ্বাসের কোনও সম্পর্ক নেই। ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে খেটে খাওয়া মানুষের আন্দোলনই যে এই সাম্প্রদায়িকতাকে রোখার হাতিয়ার তা তুলে ধরেন তিনি।

মনীষীদের ছবি ও উদ্ধৃতি বহন করে রাজাবাজারের দিকে চলেছে মিছিল

শিলিগুড়ি ও (নিচে) কোচবিহার শহরে মিছিল

বাল্যবিবাহ চালুও বিজেপির প্রতিশ্রুতি !

পরাজয় আশঙ্কা করে শেষপর্যন্ত বাল্যবিবাহ চালু করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাজস্থানে ভোট চাইল বিজেপি। একটা পার্টি আদর্শগতভাবে কতটা দেউলিয়া হলে এমন প্রতিশ্রুতি দিতে পারে। দেশে এই কুপ্রথার শিকার হাজারো মেয়ের দুঃখ-কষ্ট দেখে স্বাধীনতা আন্দোলনের মনীষীরা তা বন্ধ করার জন্য পথে নেমেছিলেন। এদেশে একদিন এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ রামমোহন রায়। এই প্রথা বন্ধ করতে একসময় মানুষের দোরে দোরে ঘুরে বেড়িয়েছেন বিদ্যাসাগরের মতো মহান মনীষী। এর জন্য বহু বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁদের। সমাজপতিরা হুঁশিয়ারি দিয়েছে, বাল্যবিবাহের মতো দীর্ঘদিনের প্রচলিত 'পবিত্র' প্রথাকে হঠালে হিন্দু সমাজ অপবিত্র হয়ে যাবে। সেই কুপ্রথাকেই নির্বিঘ্নে চালানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাজস্থানের এক বিজেপি নেত্রী ভোট চাইলেন।

রাজস্থানের মতো শিক্ষা-চিকিৎসা, দৈনন্দিন জীবনমানে পিছিয়ে থাকা রাজ্যে ভোট প্রচারে গিয়ে বিজেপি প্রার্থী যদি বলতেন, নারীশিক্ষার প্রসার ঘটাব, নারী নির্যাতন বন্ধ করব— সেটাই হত মানুষের যথার্থ কল্যাণ। তা না করে পুরনো বস্তাপচা সমস্ত অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, কুপ্রথাকে ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কয়েক যুগ পিছিয়ে দিতে চাইছেন রাজ্য তথা দেশকে। দেশ জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে— আশার কথা এটাই।

ন্যাশনাল কমিশন ফর প্রোটেকশন অব চাইল্ড রাইটস-এ প্রকাশিত রিপোর্ট বলছে, রাজস্থানে বাল্যবিবাহ সবচেয়ে বেশি। ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও বাল্যবিবাহ প্রথা চালু রয়েছে। কী বিজেপি, কী কংগ্রেস যে যখনই ক্ষমতায় থাক না কেন, ধর্মীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কার জাত কোনও কুপ্রথার বিরুদ্ধেই টুঁ শব্দটি করেনি, এগুলি টিকিয়ে রেখে ভোটব্যাঙ্ক তৈরির খেলাই খেলেছে। তাতে হাজার হাজার বালিকার জীবন নষ্ট হয়ে যাক, তাদের কিছুই যায় আসে না। রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের মতো রাজ্যে অক্ষয় তৃতীয়ায় শত শত ছেলেমেয়ের গণবিবাহের যে আয়োজন বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনগুলি করে, তার পুরোটাই ১২-১৬ বছর বয়সীদের মধ্যে। এরকম বহু জায়গায় আয়োজিত বাল্যবিবাহের পৃষ্ঠপোষক শাসক দল কিংবা বিরোধী ক্ষমতাপিপাসু দলগুলি। সম্প্রতি ইউনিসেফের রিপোর্ট বলছে, ভারতে ১৫ লক্ষ মেয়ের বিয়ে হয়ে যায় ১৮ বছরেরও কম বয়সে। এই সমস্ত বালক-বালিকাদের যে কী পরিমাণ দৈহিক এবং মানসিক ক্ষতি হয় তা পরবর্তী জীবনে এদের ধুঁকতে থাকা জীবনধারণ লক্ষ করলে যে কেউ বুঝতে পারবে। শুধু তাই নয়, অল্পবয়সে বিয়ে হওয়ায় প্রসবের সময় অনেকেরই শারীরিক জটিলতা সৃষ্টি হয়, এমনকী প্রাণসংশয় পর্যন্ত হয়ে থাকে।

প্রহিবিশন অব চাইল্ড ম্যারেজ অ্যাক্ট-২০০৬ (বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ আইন) চালু রয়েছে। কিন্তু তাতেও দেখা যাচ্ছে, বাল্যবিবাহের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। একদিকে দারিদ্র, অন্যদিকে শিক্ষার অভাব বাল্যবিবাহের মতো সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলে দেয় বহু সময়ই। আবার বর্তমান সময়ে মেয়েদের নিরাপত্তার অভাববোধ থেকে বহু অভিভাবক ভাবেন, মেয়েদের বিয়ে দিলে তারা সুরক্ষিত থাকবে। যদিও বিয়ের পরও মহিলারা গার্হস্থ্য হিংসার শিকার হন।

আধুনিক জীবন মানে যে শুধু আধুনিক গ্যাজেট, মোবাইল ফোন ব্যবহার নয়— উন্নত আধুনিক জীবনচর্চা এবং চিন্তাই যে জীবনের লক্ষ্য এ কথা দেশের ছেলেমেয়েদের শেখানোর কোনও চেষ্টাই ভোটবাজ দলগুলির নেই। ভোটের জন্য শুধু বাল্যবিবাহ কেন, কংগ্রেস-বিজেপি সতীদাহ, পণপ্রথার বিরুদ্ধেও কোনও কথা বলা দূরে থাক, বহু ক্ষেত্রে এসবেরও পৃষ্ঠপোষক।

বাস্তবে আজ আর নারীর স্বাধীনতা কিংবা নারীমুক্তির ভাবনার প্রসার ঘটানো এই দলগুলির পক্ষে সম্ভব নয়। পচে যাওয়া পুঁজিবাদী সমাজের রক্ষক কোনও দলের পক্ষেই সম্ভব নয়।

শালবনি হাসপাতাল জিন্দালকে দেওয়ার প্রতিবাদ

পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালকে জিন্দাল কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সরকারি টাকায় গড়া এই হাসপাতালটি একজন পুঁজিপতির হাতে তুলে দেওয়ার প্রতিবাদ জানিয়েছে মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টার। ১২ ডিসেম্বর সংগঠনের পক্ষ থেকে মেদিনীপুরে জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। জেলাশাসক ও জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। এ দিনের বিক্ষোভ ডেপুটেশন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রাণতোষ মাইতি, মানস কর, চন্দ্রাণী জানা, দিলীপকুমার মণ্ডল প্রমুখ।

চিটফান্ডে প্রতারিতদের বিক্ষোভ রাজভবনে

অল বেঙ্গল চিটফান্ড সাফারার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ১৩ ডিসেম্বর রাজভবনে দু'হাজারের বেশি আমানতকারী ও এজেন্ট বিক্ষোভ দেখান। চিটফান্ডের জমানো টাকা কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়িত্ব নিয়ে সুদ সহ ফেরত, এজেন্টদের সরকারি প্রতিশ্রুতি মতো নিরাপত্তা, তিনশোর বেশি এজেন্ট ও আমানতকারীর (যাঁরা আত্মহত্যা করেছেন) পরিবারকে কুড়ি লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ও এজেন্টদের যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মসংস্থান, চিটফান্ডের টাকা লুঠের জন্য দায়ী সমস্ত ব্যক্তিদের গ্রেফতার ও শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবিতে এক ঘন্টার অধিক সময় গেটগুলি অবরোধ করা হয় (ছবি)।

বিক্ষোভ থেকে মহিলা সহ ৭৩৩ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করে। অন্য দিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পূর্বাঞ্চলীয় সদর দফতরে দুই শতাধিক আমানতকারী ও এজেন্ট অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। এখান থেকে সাত জন মহিলা সহ একান্ন জনকে পুলিশ গ্রেফতার করে। সংগঠনের সভাপতি রূপম চৌধুরী এবং সম্পাদক বিশ্বজিৎ সাঁফুই এক বিবৃতিতে বলেন, সংগঠনের প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়েছে। আগামী একুশে ডিসেম্বর সারা রাজ্যে বেলা বারোটা থেকে একটা পর্যন্ত রেল ও সড়ক অবরোধ করা হবে।

একুশে জানুয়ারি রাজ্য সরকারের প্রধান দফতর ঘেরাও করা হবে। একই সাথে দিল্লিতে পার্লামেন্ট অভিযান ও অবস্থান কর্মসূচি নেওয়া হবে। তাঁরা সর্বস্তরের মানুষকে পঞ্চাশ লক্ষ এজেন্ট ও পাঁচ কোটি আমানতকারীর আন্দোলনের পাশে দাঁড়ানোর আবেদন জানান।

চিটফান্ডে প্রতারিতদের টাকা ফেরত এবং অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে ৩ ডিসেম্বর হুগলিতে ডিএম অভিযান ও অবস্থান কর্মসূচি অল বেঙ্গল চিটফান্ড সাফারার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের

২০১২ সালের ১৬ ডিসেম্বর দিল্লিতে প্যারামেডিকেল ছাত্রী নির্ভয়াকে নৃশংসভাবে অত্যাচার করে খুন করেছিল দুষ্কৃতীরা। ওই দিনটি স্মরণ করে মধ্যপ্রদেশের ভোপালে এ আই এম এস এস-এর উদ্যোগে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য সভাপতি কমরেড জলি সরকার সহ অন্যরা।

ডিওয়াইও-র উদ্যোগে আলোচনা সভা

বেকার সমস্যা প্রতিরোধে তীব্র যুব আন্দোলন গড়ে তুলতে ৯ ডিসেম্বর পশ্চিম বর্ধমান জেলা এ আই ডি ওয়াই ও-র উদ্যোগে নিয়ামতপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক যুব আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত যুবক-যুবতী। অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন প্রশ্নে মতবিনিময় করেন। মূল আলোচনা করেন এ আই ডি ওয়াই ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড নিরঞ্জন নস্কর। সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা ইনচার্জ কমরেড স্বপন মুন্সি এবং এসইউসিআই(সি)-র পশ্চিম বর্ধমান জেলা সম্পাদক কমরেড সুন্দর চ্যাটার্জী।

সহায়ক মূল্যে ধান কেনার দাবি

সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয়, সার-বীজ-কীটনাশক-বিদ্যুতের দাম কমানো প্রভৃতি দাবিতে ৩০ নভেম্বর অল ইন্ডিয়া কিষান খেতমজদুর সংগঠনের পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড় শাখার উদ্যোগে ব্লক অফিসে এডিও-র কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

মিছিল কেশিয়াড়ি মোড় থেকে শুরু হয়ে বেলদা শহর ঘুরে ট্রাফিক স্ট্যান্ডে এলে সেখানে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। ডেপুটেশন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন স্বদেশ পড়িয়া, অহীন্দ্রনাথ পাত্র, মৃণালকান্তি জানা প্রমুখ।

পাঠকের মতামত

রক্ষা করবে কে?

পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদার কৃতী ছাত্র বিনয় সন্ধ্যার সময় বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। রাত বারোটা বেজে গেলেও সে বাড়ি ফেরেনি। পরে তার নিথর দেহটির খোঁজ পাওয়া যায় রাস্তার ধারে। অনেকের অনুমান, সারা রাত ধরে বন্ধুদের সাথে অত্যধিক মদ্যপানেই এই নির্মম পরিণতি! তদন্তে প্রকৃত কারণ উঠে আসবে হয়ত।

অনেকেরই মনে আছে কলকাতার বালিগঞ্জে কয়েক বছর আগে (২০১৬) আবেশ দাশগুপ্ত নামে এক স্কুলছাত্র মদ খেয়ে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পড়ে যায় এবং বোতলের কাচ ভেঙে তার শরীরে ঢুকে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সে। এমন পরিণতির কথা প্রকাশ্যে এলে শিহরিত হয়ে ওঠেন সবাই। কিন্তু শুধু একজন বিনয় ঘোষাল বা আবেশ দাশগুপ্ত নয়, এমন লক্ষ হাজার তরতাজা ছেলেমেয়ে প্রতিদিন জীবন্ত লাশে পরিণত হচ্ছে। এর দায় কার?

আজকের একটা ছোট্ট শিশু যখন দেখছে মদ্যপানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বা সরকারি অনুমোদন রয়েছে তখন সেটা তার কাছে স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আপনার কাছে যা গ্রহণযোগ্য নয় বা প্রশ্ন চিহ্ন তৈরি করে, ছোটদের কাছে তা অত্যন্ত স্বাভাবিক হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে। কৈশোর থেকে তাই বিভিন্ন নেশায় আসক্ত হচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। রক্ষা করার দায় যাদের তারাই আজ তাদের ঠেলে দিচ্ছে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে।

আগামী প্রজন্মের কিশোর-কিশোরীদের কাছে আদর্শ চরিত্র, অনুকরণ করবার মতো নিঃস্বার্থ মানুষের দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে হবে। শুধু অর্থ রোজগারের জন্য নয়, পড়াশুনা করে মানুষের মতো মানুষ হওয়ার শিক্ষা তুলে ধরতে হবে। মদ-জুয়া-সাট্টা-অশ্লীল ছবি প্রদর্শনের সমস্ত রকমের ঢালাও ব্যবস্থা রেখে বিনয় বা আবেশদের মানুষ করা যাবে কি? এ সমস্ত ব্যবস্থা সাজিয়ে রেখে যতই তাদের বাঁচানোর চেষ্টা করি না কেন, প্রাণে বেঁচে গেলেও তাদের রক্ষা করা যাবে না। শাসককুল কোনওদিনই এ দায়িত্ব গ্রহণ করবে না। এ সত্য উপলব্ধি করে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে সে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে সাধারণ মানুষকেই।

কিংকর অধিকারী,
বালিচক, পশ্চিম মেদিনীপুর

সরকারি স্কুলে ছাত্রসংখ্যা ক্রমশ কমছে

কেন্দ্র ব্যস্ত মন্দির নিয়ে, রাজ্য মেতে উৎসবে

প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত স্তরকে বলা হয় ‘এলিমেন্টারি এডুকেশন’। কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের ‘এডুকেশনাল স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যাট এ গ্ল্যান্স ২০১৮’ রিপোর্টে বলা হয়েছে দেশের সর্বত্রই প্রাথমিক স্তরে ছাত্রসংখ্যা কমছে।

কেন কমছে? মন্ত্রকের এক প্রাক্তন কর্তার কথায়, ‘গোটা দেশেই সরকারি স্কুলের থেকে বেসরকারি স্কুলে ভর্তির প্রবণতা বেশি। ফলে সরকারি স্কুলগুলিতে ছাত্রসংখ্যা কমছে’। প্রতীচী ট্রাস্টের এক গবেষকের পর্যবেক্ষণও অনুরূপ। তাঁর কথায়, ‘গোটা দেশেই প্রাথমিক স্তরে এত বেশি বেসরকারি স্কুল তৈরি হচ্ছে যে সেখানে সরকারি স্কুলগুলি পিছিয়ে পড়ছে। বেসরকারি স্কুলে পড়ানোকে এখন অনেকেই কৌলিন্য বলে মনে করছেন’। কেন এই মানসিক পরিবর্তন?

সরকারি স্কুলে পড়ার জন্য কোনও বেতন দিতে হয় না। ছাত্রদের বই, খাতা, পোশাক সরকার থেকে দেওয়া হয় বিনামূল্যে। কখনও কখনও সাইকেল, জুতো, ব্যাগ ইত্যাদিও দেওয়া হয়। দেওয়া হয় মিড-ডে মিল। এখানে নেই মারের ভয়, ফেলের ভয়। তবুও সরকারি স্কুলে অভিভাবকদের আকর্ষণ নেই কেন? কারণ এখানে সবই পাবে ছাত্ররা, পাবে না কেবল শিক্ষা। বাবা-মায়েরা সন্তানের শিক্ষার জন্য সবই দিতে পারেন, কিন্তু কোনও কিছুর বিনিময়ে শিক্ষাকে বিসর্জন দিতে পারেন না। ফলে, কষ্ট করে বেশি টাকা দিয়েও তারা বেসরকারি স্কুলে ছেলেমেয়েদের পড়াতে চান। এটা কোনও কৌলিন্য নয়। বরং সরকারি স্কুলে ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হতে না দেওয়ার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা।

সরকারি স্কুলের প্রতি আস্থাহীনতার পরিবেশ তৈরি হয়েছে সরকারি শিক্ষানীতির ফলেই। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার ফলেই যে সরকারি স্কুল ছাড়ার প্রবণতার জন্ম ও বৃদ্ধি, অভিভাবকদের অভিজ্ঞতা সে কথাই বলছে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, ‘কেন্দ্র তো শুধু ধর্ম নিয়ে রয়েছে, শিক্ষায় মন নেই’। প্রশ্ন হল, শিক্ষায় মন কি রাজ্য সরকারেরও আছে? কেন্দ্র ব্যস্ত রামমন্দির নিয়ে, রাজ্য ব্যস্ত উৎসবে। শিক্ষার বারোটা বাজে বাজুক, তাতে এদের কী? শিক্ষা-বাণিজ্য চলতে দেওয়া যে উভয়েরই লক্ষ্য! উন্নয়নের প্রাথমিক সোপান শিক্ষা। সেই সোপান ভেঙে দিয়ে দুই সরকারই পুজো আর উৎসবের ডামাডোলে মানুষকে ভোলাচ্ছে।

নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হবে ক’দিন বাদেই। সরকার শিক্ষার ভাল চাইলে অতি দ্রুত পাশ-ফেল চালু করুক।

রাজভবনের গেটে বিক্ষোভ। ২৯ মে ২০১৭

প্রাথমিকে ছাত্রছাত্রী ভর্তির সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান

বর্ষ	ছাত্র	ছাত্রী	মোট
২০১১-১২	৭২৬	৬৭২	১৩৯৮
২০১২-১৩	৬৯৬	৬৫২	১৩৪৮
২০১৩-১৪	৬৮৬	৬৩৮	১৩২৪
২০১৪-১৫	৬৭৬	৬২৯	১৩০৫
২০১৫-১৬	৬৬৯	৬২২	১২৯১

সূত্র ঃ কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের ‘এডুকেশনাল স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যাট এ গ্ল্যান্স’, ২০১৮ রিপোর্ট (হিসাব লক্ষে)

প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল

একের পাতার পর

এসইউসিআই(সি) এর তীব্র প্রতিবাদ করেছে, গড়ে তুলেছে লাগাতার আন্দোলন। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে পাশ-ফেল ফেরানোর কথা নীতিগতভাবে ঘোষণা করাতে এস ইউ সি আই (সি)-কে বহু রক্ত ঝরাতে হয়েছে। আইন অমান্য, বিধানসভায় বিক্ষোভ, বাংলা বনধ ডাকা থেকে শুরু করে দিল্লিতে সংসদ অভিযান, রাজ্যে রাজ্যে আন্দোলন— সবই করতে হয়েছে। পুলিশি অত্যাচারে দুই কর্মীর চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এই আন্দোলন দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে চলছে। পাশ-ফেল চালুর দাবিতে এস ইউ সি আই (সি)-র যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য, ধারাবাহিক আন্দোলন জনগণের মধ্যে প্রবল সমর্থন তৈরি করে। অন্য দিকে বিভিন্ন সমীক্ষা রিপোর্টের মধ্য দিয়ে শিক্ষার অবনমনের ভয়াবহ চিত্র সামনে আসতে থাকে। পাশাপাশি সরকারি স্কুলগুলিতে ছাত্রসংখ্যা কমে যাওয়া, বহু স্কুল উঠে যাওয়া এবং বেসরকারি স্কুলের সংখ্যাবৃদ্ধি ও তাতে ছাত্র সংখ্যা বেড়ে যাওয়া ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সরকারি শিক্ষানীতির কুফল পরিষ্কার হয়ে যায়। এই অবস্থায় জনমতের চাপে বাধ্য হয়ে সরকার পাশ-ফেল ফেরানোর কথা ভাবতে শুরু করে।

এস ইউ সি আই (সি)-র দাবি, প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশ-ফেল ফেরাতে হবে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর ঘোষণা পাশ-ফেল ফিরবে কেবল পঞ্চম এবং অষ্টম শ্রেণিতে। রাজ্য সরকারের বক্তব্যও তাই। কিন্তু শুধু পঞ্চম ও অষ্টমে কেন? পাশ-ফেল না থাকার ক্ষতি কি শুধু এই দুটি ক্লাসেই হচ্ছে? প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণিতে পাশ-ফেল না থাকায় পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে যে অনীহা তৈরি হয়েছে তা কি পূরণ হতে পারে মাত্র দুটো ক্লাসে ফেরানোর দ্বারা? পাশ-ফেলের প্রয়োজনীয়তা দেশের মানুষ বুঝলেও বোঝেন না শুধু মন্ত্রীরা। তবুও দুটো ক্লাসে ফেরানোর যে বোধোদয় হয়েছে সরকারের এবং তা ঘোষিতও হয়েছে, এটা গণআন্দোলনের বিরাট জয়। একই সাথে সরকারের নীতিগত পরাজয়। পরাজয় কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারেরই।

পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার যে অজুহাতই সরকার দিক, সরকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার বেসরকারিকরণের জমি তৈরি করে দেওয়া এবং দুই শ্রেণির নাগরিক তৈরি করা— একদল ধনী যারা বেসরকারি স্কুলে প্রচুর টাকা দিয়ে সন্তানদের পড়াতে পারবে, উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ পাবে এবং শেষ পর্যন্ত সঙ্কুচিত চাকরির সবটাই পাবে। অন্য দিকে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আর্থিক সঙ্গতির অভাবে সরকারি স্কুলেই যাবে এবং নিম্নমানের শিক্ষা নিয়ে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়বে। ধনীদের সুবিধা করে দেওয়া এবং গরিবদের সাধারণ মানের শিক্ষায় আটকে রাখাই ছিল এর প্রকৃত উদ্দেশ্য। পাশ-ফেল অবলুপ্তির ৪০ বছরের অভিজ্ঞতা এ কথাই বলছে। আজও নানা অছিলায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার পাশফেল চালুকে আটকে রাখছে।

সরকারগুলি পাশ-ফেলের বিপক্ষে থাকলেও সাধারণ মানুষ চায় তা এখনই চালু হোক এবং হোক প্রথম শ্রেণি থেকেই। দল মত নির্বিশেষে শিক্ষার স্বার্থে সাধারণ মানুষ পাশ-ফেলের প্রশ্নে এককাট্টা বলেই এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষে সম্ভব হয়েছে এতবড় একটা রাষ্ট্রশক্তির ভুল নীতি পরাস্ত করার আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং সরকারকে নীতিগত ভাবে তা মানতে বাধ্য করতে।

আজ প্রয়োজন আন্দোলনকে আবার শাণিত করা। পাশ-ফেল চালুর প্রশ্নে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির এই যে পরিকল্পিত নিষ্ক্রিয়তা, প্রয়োজন তাকে ভাঙা। সেই লক্ষ্যেই এস ইউ সি আই (সি) আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। আহ্বান জানিয়েছে সকলকে সামিল হওয়ার। সন্তানদের ভবিষ্যৎ আর নষ্ট হতে দেওয়া চলে না।

তথ্যের আলোকে পাশ-ফেল

● ২৩ মে ২০১৭, কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের স্কুল শিক্ষা সচিব অনিল স্বরূপ সংবাদ মাধ্যমকে জানান, “অধিকাংশ রাজ্যই (২৫টি) শিক্ষার মানোন্নয়নের কথা মাথায় রেখেই পাশ-ফেল চালুর পক্ষে সওয়াল করেছে। তবে কোন ক্লাস থেকে চালু করা হবে সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।” (এই সময় ২৪.০৫.২০১৭)

● সেন্ট্রাল অ্যাডভাইসরি বোর্ড অব এডুকেশন (সিএবিএ) তার ৬৪ তম মিটিং-এ পাশ-ফেল পুনঃপ্রবর্তনের পক্ষে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেন্দ্রের পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটির রিপোর্টও বলছে, সরকারি স্কুলে পঞ্চম শ্রেণির ৫৩.২ শতাংশ ছাত্রছাত্রী দ্বিতীয় শ্রেণির বই পড়তে পারে না বা ওই ক্লাসের ৪৬.৬ শতাংশ ছাত্রছাত্রী দুই অঙ্কের যোগ-বিয়োগ করতে পারে না বা ৭৫ শতাংশের বেশি ছাত্রছাত্রী করতে পারে না গুণ অঙ্ক। এর কারণ ঢালাও পাশের নীতি।

● কেন্দ্রের বিজেপি সরকার যে নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১৬-র খসড়া তৈরি করেছে তাতে মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের বক্তব্যেও স্বীকার করা হয়েছে অবাধ প্রমোশন নীতি (পাশ-ফেল প্রথা না থাকা) ছাত্রছাত্রীদের ‘অ্যাকাডেমিক পারফরম্যান্স’কে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এর পরেও সরকার সব ক্লাসে পাশ-ফেল চালু করবে না কেন?

ক্যারিবিয়ান উপসাগরে সামরিক ঘাঁটি গাড়ছে রাশিয়াও

রাশিয়াও এবার ল্যাটিন আমেরিকায় সামরিক ঘাঁটি গাড়তে চলেছে। সম্প্রতি ক্যারিবিয়ান উপসাগরে ভেনেজুয়েলার একটি দ্বীপ 'লা অর্চিলা'য় রাশিয়ার টিইউ-১৬০ বোমারু বিমান মোতায়েনের সিদ্ধান্তে সম্মতি জানিয়েছেন ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো। প্রস্তুতি বহুদিনের। দশ বছর আগে রুশ বিশেষজ্ঞরা সেনাবাহিনীর অফিসারদের সঙ্গে ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাস থেকে ২০০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বের এই দ্বীপটি পর্যবেক্ষণ করে গিয়েছিলেন।

ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির উপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের শকুনি দৃষ্টি বহু দিনের। কয়েকমাস আগে ভেনেজুয়েলায় সৃষ্টি হওয়া অর্থনৈতিক সংকট ও দেশজোড়া বিক্ষোভের পিছনে আমেরিকার ভূমিকা প্রকাশ্যে এসে গিয়েছিল। প্রকাশ্যে এসে গিয়েছিল প্রেসিডেন্ট মাদুরোকে হত্যা করার মার্কিনি ষড়যন্ত্রও। এই সিদ্ধান্তে স্পষ্ট যে প্রতিদ্বন্দ্বী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে জমি ছেড়ে দিতে রাজি নয় বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের আরেক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি রাশিয়া।

সম্প্রতি রাশিয়া ভেনেজুয়েলার খনিজ তেল শিল্পে ৫ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ বিনিয়োগ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ভেনেজুয়েলায় ৬ লক্ষ টন গম পাঠানোর কথাও বলেছে তারা। এছাড়া নিজেদের সামরিক বাহিনী ও অস্ত্রভাণ্ডার শক্তিশালী করতে রাশিয়ার সাহায্য নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভেনেজুয়েলা। ভেনেজুয়েলার কৃষি, ওষুধ, যোগাযোগ ব্যবস্থার মতো বিষয়গুলিতেও এই দুই দেশ যৌথ প্রকল্প গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করেছে। এতে রাশিয়ার দেশীয় পুঁজিপতিদের মুনাফার স্বার্থ যেমন রক্ষিত হবে, তেমনই ভেনেজুয়েলার উপর অর্থনৈতিক ও সামরিক ভাবে প্রভাবও বিস্তার করতে পারবে তারা। এইভাবে ল্যাটিন আমেরিকা সম্পর্কে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে টক্কর দেওয়ার বন্দোবস্ত করে নিল রাশিয়া, যেটা তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। ল্যাটিন আমেরিকার উপর গবেষণারত রুশ গবেষক এমিল দাবাগিয়ানের বক্তব্যে উঠে এসেছে এই উদ্দেশ্যের কথা— "ভেনেজুয়েলার খনিজ তেল উত্তোলন শিল্প থেকে যেহেতু যথেষ্ট মুনাফা হয়, তাই রাশিয়া চায় না সেখানে সরকার পাল্টাক। তাই আমরা ভেনেজুয়েলা সরকারকে টিকে থাকতে মদত দিচ্ছি"। রাশিয়ার এই সাহায্য স্বাভাবিক কারণেই সাগ্রহে বরণ করছে ভেনেজুয়েলা সরকার। তাদের এক বিশেষজ্ঞের কথায়, "মাদুরো সরকারকে অবৈধ বলে দাগিয়ে দিতে চাইছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। যে কোনও সময় তাদের আগ্রাসনের সম্ভাবনা থেকে দেশকে রক্ষা করতে এই মুহূর্তে রাশিয়ার সঙ্গে যৌথ মহড়া বা অন্যান্য সামরিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ ভেনেজুয়েলার পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ"। অতএব সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব ঘটেছে, যারা আন্তর্জাতিক ভাগ পাওয়ার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে টক্করে নেমেছে। পরিণাম কী হবে ভবিষ্যতই বলবে।

বেতন হ্রাস ঃ ব্যাঙ্ক কর্মীরা আন্দোলনে

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার এটিএমগুলিতে কর্মরত গার্ডদের ডেজিগনেশন পরিবর্তন করে হাউজ কিপিং স্টাফ হিসাবে দেখিয়ে তাঁদের মাথাপিছু বেতন এক ধাক্কায় তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেন এই সিদ্ধান্ত? স্টেট ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ কোনও উত্তর দেয়নি।

এরই প্রতিবাদে অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক কন্ট্রাকচুয়াল এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের উদ্যোগে ৮ ডিসেম্বর রায়গঞ্জ প্রেস ক্লাবে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের স্থায়ী এবং অস্থায়ী কর্মীদের উপস্থিতিতে এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য, কমরেড বঙ্কিমচন্দ্র বেরা বলেন, "জিনিসপত্রের দাম যখন ক্রমশ বাড়ছে তখন বেতন বাড়ানোর পরিবর্তে কমিয়ে দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। কর্তৃপক্ষ স্থায়ী কাজে স্থায়ী নিয়োগ না করে হায়ার অ্যান্ড ফায়ার কৌশল নিয়ে চলছে। বহু জায়গায় বাড়তি পারিশ্রমিক ছাড়াই ৮ ঘন্টার বেশি কাজ করানো হচ্ছে।" তিনি সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলে আন্দোলনে সামিল হওয়ার আবেদন জানান। কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন আইডিবিআই ব্যাঙ্ক আন্দোলনের নেতা বিজয় লোধ, গোপাল দেবনাথ প্রমুখ। ফোরামের পক্ষ থেকে ২৮ ডিসেম্বর কলকাতার বিবাদি বাগে বেঙ্গল চেম্বার্স অফ কমার্সের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছে।

জীবনাবসান

কোচবিহারে এস ইউ সি আই (সি) দিনহাটা লোকাল কমিটির প্রাক্তন সদস্য কমরেড দীনবন্ধু বর্মণ দীর্ঘ দিন ধরে মেরুদণ্ডের জটিল রোগে ভুগে ৭ ডিসেম্বর তাঁর বাড়িতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। মৃত্যুসংবাদ শুনে এলাকার কর্মী-সমর্থক-দরদিরা এবং অনেক সাধারণ মানুষ তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে শ্রদ্ধা জানান।

আটের দশকে তিনি দলের কাজে যুক্ত হন। ১৯৮৮ সালে প্রথম দিনহাটা লোকাল কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। দিনহাটা মহকুমায় সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রথম দিকে যে কয়েকজন উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন কমরেড দীনবন্ধু বর্মণ তাঁদের অন্যতম। তাঁর নিজের এলাকা মাতালহাট একটা সময় কুখ্যাত ডাকাত দলের মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। তার বিরুদ্ধে কমরেড দীনবন্ধু বর্মণ প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এলাকার লোকজনকে সংগঠিত করে গণঅন্দোলন গড়ে তোলেন এবং সেই ডাকাত দলকে এলাকা ছাড়া করে শান্তি ফিরিয়ে আনেন। পরিবারের সদস্যদেরও দলের কর্মীতে পরিণত করেন তিনি। গত ৩ বছর ধরে তিনি প্রায় শয্যাশায়ী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন মূল্যবান সংগঠককে হারাল।

তাঁর স্মরণে ১৪ ডিসেম্বর ভুতকুড়ায় দলীয় কার্যালয়ে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। দলের কোচবিহার জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অসিত দে তাঁর বিপ্লবী জীবনের শিক্ষণীয় দিকগুলি তুলে ধরেন।

কমরেড দীনবন্ধু বর্মণ লাল সেলাম

ধর্মঘটের ডাক

একের পাতার পর

বিদায় দাও। এরূপ শ্রমিকদের প্রায় কোনওরূপ সামাজিক সুরক্ষাও থাকছে না। বাস্তব অবস্থা এমন করা হচ্ছে যাতে তাঁরা প্রতিবাদ করতে, কোনও ইউনিয়ন করতে না পারেন। তাঁদের আধুনিক যুগের দাস শ্রমিকে পরিণত করা হচ্ছে। অঙ্গনওয়াড়ি, আশা, মিড-ডে মিল কর্মী সহ স্কিম কর্মীদের জন্য বাজেটে টাকা কমানো হচ্ছে। জিএসটি চালু করে শ্রমিকদের কল্যাণমূলক প্রকল্পের জন্য সেস তোলা বন্ধ করা হয়েছে। ফলে বিড়ি শ্রমিক সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রমিক কল্যাণমূলক প্রকল্প সঙ্কটের মধ্যে পড়েছে। নোট বাতিলের জন্য ২ লক্ষ ৩৪ হাজার ক্ষুদ্র শিল্প বন্ধ হয়েছে। সংগঠিত ক্ষেত্রে প্রায় ১৭ লক্ষ এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রে প্রায় ৭০ লক্ষ শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন। হকারদের জীবন-জীবিকা রক্ষার কোনও ব্যবস্থা করছে না সরকার। সকল শ্রমজীবী মানুষের উপরই ভয়াবহ আক্রমণ নেমে আসছে।

শুধু শ্রমিকদের ক্ষেত্রেই নয়, বিজেপি সরকার কৃষক-বর্গাদার-খেতমজুরদের স্বার্থ দু'পায়ে মাড়িয়ে কৃষিজমি অধিগ্রহণ অর্ডিন্যান্স এনেছে, যা বৃহৎ পুঁজিপতি, জমি মাফিয়া ও প্রোমোটারদের স্বার্থ রক্ষা করছে। অন্যদিকে সুকৌশলে শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ আনার জন্য পিছিয়ে পড়া নানা চিন্তা খুঁচিয়ে তুলছে এবং সাম্প্রদায়িক বিভেদ আনছে যা ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনের সামনে বাধা হিসাবে কাজ করছে।

আমাদের দেশের শতকরা ৯৫ জন মানুষ শ্রমিক ও কৃষক। এই শ্রমিকদের ৯৪ শতাংশ অসংগঠিত শিল্পের শ্রমিক— যার বেশির ভাগই ন্যূনতম মজুরি থেকেও বঞ্চিত। শুধু বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য কিনতেই এঁদের পকেট ফাঁকা। অন্য পণ্য কেনার ক্ষমতাই এঁদের নেই। ৬ শতাংশ সংগঠিত শিল্পের শ্রমিকদেরও উৎপাদিত পণ্যের মজুরির অংশ দিনের পর দিন কমছে। এভাবে মজুরদের শ্রম লুঠ করার ফলে বাড়ছে মালিকের লাভের পরিমাণ। সর্বত্র শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি কমছে। এর ফলে শ্রমিকদের ক্রয় ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। গ্রামীণ কৃষক ও খেতমজুরদের অবস্থা আরও ভয়াবহ। উৎপাদন খরচের চেয়ে কম দামে ফসল বিক্রি করতে কৃষক বাধ্য হচ্ছে। ফলে বেশিরভাগ কৃষকের শিল্পপণ্য কেনার ক্ষমতা নেই। এই অবস্থায় বাজারসংকট নিরসনের কোনও রাস্তা নেই। বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যতদিন থাকবে ততদিন শিল্পের অবাধ বিকাশের কোনও সম্ভাবনা নেই।

১৯৯১সালে কংগ্রেসের অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের আমলে নয়া আর্থিক নীতি গ্রহণের মধ্য দিয়ে বেসরকারিকরণ ও উদারিকরণের সিংহদুয়ার খুলে দেওয়া হয়। এই নীতি অনুসরণ করে একের পর এক শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী নতুন আইন ও কর্মসূচি নিয়ে আসে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন পরের পর সব সরকারগুলি। স্বাধীনতার ৭০ বছরে ভোটের দ্বারা বহুবার সরকার পরিবর্তন হলেও মালিক শ্রেণির এই শোষণ অত্যাচার বন্ধ হয়নি। এভাবে হয় না। শোষণ-বঞ্চনা বন্ধ করতে হলে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রমিক আন্দোলন তীব্রতর করা জরুরি।

এই শ্রমিক আন্দোলন তীব্র করতে হলে শুধু কনভেনশন, মিছিল-সমাবেশ নয়— প্রয়োজন অবরোধ, আইন অমান্য, ধর্মঘট সহ বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক কর্মসূচি এবং এর মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের চেনানো— কারা এদের শোষণ করছে, কীভাবে করছে, কোন কোন রাজনৈতিক দল এই শোষণের পক্ষের শক্তি। উপলব্ধি করানো দরকার মালিকী ব্যবস্থা উচ্ছেদ করলে শ্রমিক শৃঙ্খল ছাড়া অন্য কিছু হারাবে না। কিন্তু জয় করবে গোটা দুনিয়া। এক কথায়, লেনিন যাকে বলেছেন, শ্রমিক আন্দোলন হল কমিউনিজমের বিদ্যাপীঠ— সেই লক্ষ্যেই শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনা করতে হবে। এই চেতনারই আজ ভীষণ অভাব। এজন্য কারখানায় কারখানায় শ্রমিক কমিটি গড়ে তুলে মতবাদিক সংগ্রাম চালাতে হবে। ধর্মঘটের কথা শুনলেই মালিক শ্রেণি ও তাদের তল্পিবাহকরা চিৎকার করে ওঠে। বলে— 'ধর্মঘট কর্মনাশা'। ধর্মঘটের জন্যই দেশের শিল্প-কারখানা বন্ধ হচ্ছে ও উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে বলে তারা মিথ্যা প্রচার করে। অথচ শ্রমদপ্তরের তথ্যানুযায়ী ২০১৩ সালে শ্রমিকদের ধর্মঘটের ফলে কোনও শ্রম দিবস নষ্ট হয়নি। কিন্তু মালিকদের করা লকআউটের ফলে শ্রম দিবস নষ্ট হয়েছে ১ কোটি ৫০ লক্ষ ৩০ হাজার। বাস্তবে শ্রমিকরা কখনওই উৎপাদন ব্যাহত করতে চায় না। কারণ কারখানা চালু থাকলে শ্রমিকরা কাজ ও মজুরি পাবে। বাধ্য না হলে শ্রমিক কখনও ধর্মঘটে যায় না। বাস্তবে মালিকরা তীব্র শোষণ ও বঞ্চনার মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের ধর্মঘটের পথে ঠেলে দেয়।

এ আই ইউ টি ইউ সি দল মত নির্বিশেষে সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের কাছে আগামী ৮-৯ জানুয়ারি সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘট সফল করার আহ্বান জানিয়েছে।

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS/138/2016-18

চটকল খোলার দাবিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

মুনাফা না হওয়ার অজুহাতে হুগলির তিনটি চটকল পরপর বন্ধ করে দেয় মালিকরা। এর ফলে প্রায় পনেরো হাজার শ্রমিক এবং তাঁদের পরিবার সংকটে পড়ে। দিনের পর দিন যাচ্ছে কিন্তু মিল খোলার নাম নেই। সংকটগ্রস্ত শ্রমিকেরা এআইইউটিইউসি-র নেতৃত্বে আন্দোলনে নামেন। বেঙ্গল জুটমিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি দিলীপ ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘বন্ধ চটকল খুলতে রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার কার্যকরী কিছু করছে না। শ্রমিক পরিবার এবং এঁদের উপর নির্ভরশীল এলাকার ছোট ব্যবসায়ী মিলিয়ে প্রায় এক লক্ষ মানুষ অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন।’’ এআইইউটিইউসি রাজ্য সরকারের কাছে দাবি করেছে, যতদিন না মিল খুলছে ততদিন শ্রমিক পরিবারগুলিকে বিনা পয়সায় রেশন দিতে হবে এবং দ্রুত মিল চালু করে সমস্ত শ্রমিককে কাজে ফেরাতে হবে।

ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মী নিগ্রহের প্রতিবাদ

তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ডাঃ বঙ্কিমপ্রসাদ রায়কে মারধর করা হয়। এই ঘটনায় দু'জন অভিযুক্তের নামে তুফানগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়। কিন্তু দু'মাসেও তারা গ্রেপ্তার হয়নি। অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবিতে সরকারি হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসকদের সংগঠন সার্ভিস ডক্টর্স ফোরাম ১৫ ডিসেম্বর মিছিল করে শহর পরিক্রমা করে। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস, জেলা সম্পাদক ও সভাপতি যথাক্রমে ডাঃ সুমন মিস্ত্রি ও ডাঃ অনুজ বিশ্বাস। মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের কাছে তাঁরা দাবিপত্র প্রদান করেন। পুলিশ জানায়, অভিযুক্তরা ভিনরাজ্যে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। দ্রুত তাদের গ্রেপ্তার করা হবে।

হাসপাতালে আধ্যাত্মিক সভার প্রতিবাদ

আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ একটি সার্কুলার দিয়ে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, চিকিৎসক, হাউস স্টাফ ও নার্সদের ১৫ ও ১৭ ডিসেম্বর এক আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানে যোগদান করতে বলেছেন। রোগী কল্যাণ সমিতি আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের নাম প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী ইন্টার‍্যাক্টিভ আধ্যাত্মিক সভা। এর প্রতিবাদে ১৪ ডিসেম্বর এমএসসি, এসডিএফ, নার্সেস ইউনিটি, হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠন যৌথভাবে সল্ট লেকের স্বাস্থ্যভবনে বিক্ষোভ দেখায়। ডাক্তারি ছাত্র, নার্স এবং চিকিৎসকরা উপস্থিত ছিলেন।

তমলুকে মদবিরোধী আন্দোলনে এলাকার মানুষ

পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক পৌরসভার রত্নালি মৌজায় রেজিস্ট্রি অফিস এলাকায় ৫০ মিটারের মধ্যে দু-দুটি সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকান আছে। সুস্থ পরিবেশ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় এলাকার মানুষ ‘মদবিরোধী নাগরিক কমিটি’ গড়ে তুলে দীর্ঘ সাত মাস ধরে দোকান দুটি বন্ধের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। আন্দোলনের চাপে গত জুন মাস থেকে দুটি দোকানই বন্ধ রয়েছে। সম্প্রতি আবার সেগুলি খোলার তোড়জোড় শুরু হলে মানুষ আবারও প্রতিবাদে সামিল হন।

১৪ ডিসেম্বর কমিটির পক্ষ থেকে জেলাশাসক ও আবগারি দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। পরদিন কমিটির উদ্যোগে এলাকার মানুষ রত্নালির ফুলতলা থেকে পুলিশ সুপার অফিস পর্যন্ত মিছিল করেন।

কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সঞ্জয় কর ও নুরুল ইসলাম জানান, যতদিন মদের দোকান খোলার সিদ্ধান্ত বাতিল করা না হচ্ছে, ততদিন আন্দোলন চলবে। প্রয়োজনে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি নেওয়া হবে।

৯০ শতাংশ বিধায়কই কোটিপতি

এঁরা কাদের প্রতিনিধি!

সদ্য সমাপ্ত মিজোরাম বিধানসভা নির্বাচনে নির্বাচিত ৪০ জন বিধায়কের মধ্যে ৩৬ জনই কোটিপতি। অর্থাৎ ৯০ শতাংশ বিধায়কই কোটিপতি। হিন্দি বলয়ের তিন রাজ্য রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে জয়ী ৫১৯ জন বিধায়কের মধ্যে ৪০০ জন কোটিপতি। শতাংশের হিসাবে ৭৭ শতাংশ। মধ্যপ্রদেশে ২৩০ জন সদস্যের মধ্যে ১৮৭ জনই কোটিপতি। এর মধ্যে বিজেপি বিধায়ক সত্যেন্দ্র পাঠকের সম্পত্তি সবচেয়ে বেশি— ২২৬ কোটি টাকা। ছত্তিশগড়ে ৯০ জন সদস্যের মধ্যে ৬৮ জন কোটিপতি। সবচেয়ে ধনী বিধায়ক কংগ্রেসের টি এস সিংহদেওর সম্পত্তি ৫০০ কোটি টাকার। প্রার্থীরা নিজেদের সম্পত্তির যে হিসাব নির্বাচন কমিশনে দিয়েছেন, সেই ভিত্তিতেই অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্ম (এডিআর) বলেছে, বিজেপি, কংগ্রেস, নানা আঞ্চলিক দল সহ নির্দল বিধায়কদের মধ্যে অধিকাংশই কোটিপতি।

এর আগে হওয়া রাজ্যসভার নির্বাচনে ৮৭ শতাংশই প্রার্থীই ছিলেন কোটিপতি। প্রার্থীদের গড় সম্পত্তির পরিমাণ ১২২ কোটি টাকা। শুধু রাজ্যসভার ক্ষেত্রেই নয়, সাধারণ মানুষ সরাসরি ভোট দিয়ে লোকসভার জন্য যে এমপিদের নির্বাচন করেন, তাঁরা অর্থনৈতিক ভাবে কোন শ্রেণির? ৫৪৩ আসন বিশিষ্ট বর্তমান ১৬তম লোকসভায় ৪৪৯ জনই কোটিপতি। অর্থাৎ কোটিপতি সাংসদ প্রায় ৮৩ শতাংশই। এই সমস্ত তথ্য দেখাচ্ছে, সংসদের উচ্চ ও নিম্ন — উভয় কক্ষেই দেশের আমজনতার কোনও প্রতিনিধি নেই। রাজ্যে রাজ্যে বিধানসভার চিত্রটা কমবেশি এরকমই।

১৩৬ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে যে ৯৯ ভাগ মানুষ দরিদ্র-নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত অংশের মধ্যে পড়েন, এইসব এমএলএ-এমপিরা কি তাঁদের প্রতিনিধি? সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে এঁদের কি কোনও যোগ আছে? সংসদীয় গণতন্ত্রকে ‘বাই দি পিপল, ফর দি পিপল, অব দি পিপল’ বলা হলেও বাস্তবে এ গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি ধনীদের কব্জায়। কংগ্রেস, বিজেপি সহ পুঁজিপতিদের স্বার্থে পরিচালিত, তাদের অর্থে পুষ্ট আঞ্চলিক দলগুলি রাজ্যে কিংবা কেন্দ্রে যাঁদের প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করাচ্ছে, তাঁরা কেউ সৎ, সংগ্রামী ব্যক্তি নন। তাঁরা বিপুল পুঁজির মালিক এবং এটাই তাঁদের একমাত্র যোগ্যতা। পার্লামেন্ট ও বিধানসভাগুলি তাই আজ একচেটিয়া পুঁজির দাসে পরিণত হয়েছে। এখন ভোট হয় অর্থ ও প্রচারের জোরে। মিডিয়া পাওয়ার, মানি পাওয়ার আর মাসল পাওয়ারই যে ভোটকে নিয়ন্ত্রণ করে, এ আজ সকলেই জানে। একদল হারে, একদল জেতে, কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনের দুরবস্থা বদলায় না।

পার্লামেন্টে-বিধানসভায় পুঁজিপতিদের স্বার্থে কোনও বিল পেশ হলে, এইসব কোটিপতি এমপি-এমএলএ-রা তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেন না। নিজেদের শ্রেণি স্বার্থেই এরা তার পক্ষে দাঁড়ান। জনস্বার্থের নামে এঁরা বড়জোর এলাকায় কিছু রাস্তাঘাট করতে পারেন, কিছু দান-খয়রাতি করতে পারেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনের প্রধান সমস্যা মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, আর্থিক দুর্দশা ইত্যাদি দূর করার ক্ষেত্রে কার্যকরী কোনও ভূমিকা নিতে পারেন না। কারণ শোষণমূলক অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরিকাঠামো হিসাবে পার্লামেন্ট বা বিধানসভাগুলি এই শোষণব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতেই সাহায্য করে। তার বাইরে সে যেতে পারে না। ফলে পার্লামেন্ট-বিধানসভায় মনীষীদের ছবি টাঙানো থাকলেও তাঁদের বহুআকাঙ্ক্ষিত গণমুক্তির স্বপ্ন মর্যাদা পায় না। গরিব-মধ্যবিত্তের জীবনের সমস্যার কোনও সমাধান হয় না। আক্ষরিক অর্থেই এগুলি আজ কোটিপতিদের প্রতিষ্ঠান এবং তার কাজও বাস্তবে কোটিপতিদের স্বার্থেই। এই পার্লামেন্টে শোষিত শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব নেই। প্রবল গণআন্দোলনের আবহে দু-একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হলেও এবং সততার সাথে তাঁরা কাজ করলেও জনজীবনের মৌলিক সমস্যা, যা সৃষ্টি হচ্ছে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায়, তার সমাধান হবে না।

নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে কলকাতায় কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের সামনে দামিনী দিবস উপলক্ষে ১৭ ডিসেম্বর এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সাংবাদিক দিলীপ চক্রবর্তী, চিকিৎসক অধ্যাপক নূপুর ব্যানার্জী, শিক্ষক গুঞ্জন দত্ত, অরিজিৎ ভট্টাচার্য প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক পবিত্র গুপ্ত। এছাড়া আবৃত্তি, সঙ্গীত, নৃত্য ও পথনাটক পরিবেশিত হয়।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com